বিড়ম্বনা

(গল্পগ্রন্থ – উপলখণ্ড)

বিষ্ণু অনেকদিন পরে দেশে ফিরল শীতকালে।

পৌষ মাসের প্রথম। স্টেশন থেকে নেমে গ্রামে যাওয়ার পথে কলাই-মুগের ক্ষেতে সুঁটি পেকে উঠেছে। কোনো ক্ষেত্রে ফসল কাটা হয়ে খালি জমি পড়ে আছে। লোকের বাড়ির উঠান পর্যন্ত ছোট এড়াঞ্চির ঝোপ। শীতের সময় সাদা সাদা থোকা থোকা ফুলে মাঠ বন ভর্তি। নতুন কাটা খেজুর রসের সুগন্ধ পথের বাতাসে।

গ্রামের নাম ধুতরোবেড়ে—ছ ক্রোশ দূর স্টেশন থেকে। আজ গ্রামে পৌঁছানোযাবে না, বেলা পড়ে এসেছে। বেশি দূরও যাওয়া যাবে না, আরামডাঙা কিংবা সোনাখালি-বাকসা পর্যন্ত সন্ধ্যের আগে পৌঁছে আশ্রয় নিতে হবে কোথাও। বিষ্ণু দু বছর আগে দিন দশেকের জন্যে গ্রামে এসে দিন-কতক জ্ঞাতি ভাইপোর বাড়িতে ছিল, তার আগে আসেনি বোধ হয় তের কি চৌদ্দ বছর। সে থাকে বহুদূর সম্বলপুর জেলা, টিটলাগড় বলে এক গ্রামে। ওখানকার এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ জমিদারের ছেলের প্রাইভেট টিউটর। বয়স হয়েছে বটে, প্রাইভেট টুইশানি করার সময় এখন নয়—কিন্তু ভাগ্য এর চেয়ে কোনো ভাল জিনিস ওকে দেয়নি। অনতিক্রম্য অদৃষ্ট কেবল দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আজ কত বৎসর। উন্নতি হয়নি জীবনে, হবে যে কোনোদিন তার আশাও কম। পরের বাড়ি থেকে থেকে পরের ছেলেকে মানুষ করে বয়স প্রায় চল্লিশের কোঠায় ঠেকল।

পথে মথুরাপুরের সতীশ কলু গরুরগাড়িতে ধানের বস্তার ওপর বসে আসছে। সেই সতীশ কলু, ধুতরোবেড়ের হরি গুরুমশায়ের পাঠশালায় দুজন একসঙ্গে পড়ত—অনেককাল পরে দেখা, তবুও বিষ্ণু চিনতে পারল।

—ও সতীশ, ভাল আছ? চিনতে পার?

সতীশের মাথার চুলে পাক ধরেছে, চেহারাখানি বেশ স্থূল ও হৃষ্টপুষ্ট। সে ঠাওর করে দেখে বলে উঠল—আরে, আমাদের সেই বিষ্ণু না? কোথায় আছ আজকাল?

—থাকি অনেক দূর, উড়িষ্যায় সম্বলপুর জেলা।

—সে আবার কোথায়?

—অনেক দূর। সে তুমি বুঝতে পারবে না।

—কোন্ রেলে যেতে হয়?

—হাওড়া থেকে উঠতে হয়।

—কি কর সেখানে? কত মাইনে পাও?

—ছেলে পড়াই। গোটা পঞ্চাশেক টাকা পাই।

সতীশ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বললে—মোটে! এলতলা, বেলতলা, শেষ বুড়ির বটতলা! তার চেয়ে যে আমরা দেশে থেকে ভালই করছি। এবার ধানের কাজ করে—তোমায় বলতে কি—চারটি হাজার টাকা তোমার মা-বাপের আশীর্বাদে—

সতীশের রোজগার-পুষ্ট ভুঁড়ির ভারে বিব্রত বলদ দুটি গাড়ি বহন করে ক্রমে দূরে চলে গেল। সে আর সতীশ কলু। একদিন ক্লাসে ভাল ছেলের অধিকারে গুরুমশায়ের নির্দেশমত সে সতীশ কলুর কান মলে দিয়েছিল, হাতে নাড়ুগোপালের ইঁট তুলে দিয়েছিল। আজ সতীশ তার শোধ তুলে নিলে। তবুও তো সে সতীশকে আসল মাইনের চেয়ে কিছু বাড়িয়ে—বেশ কিছু বাড়িয়ে—বলেছে। পরের বাড়িতে থাকা খাওয়া আর ত্রিশ টাকা মাইনে শুনলে সতীশ না জানি কি বলত!

অনেক দিন না এলেও সে চিনতে পেরেছে, দূরের ওই বটগাছটা সোনাখালি-বাকসার কুঠিবাড়ির বটগাছ। বেলা পড়ে এসেছে—সন্ধ্যে হবার দেরি নেই।সোনাখালিতে রাত্রে কারও বাড়ি থাকতে হবে। কিন্তু ও গ্রামে

ভদ্রলোকের বাড়ি বেশি নেই বলেই তার জানা আছে। যা হোক, একজনের কারও বাড়িতে থাকার জোগাড় করতেই হবে।

গ্রামে ঢুকে প্রথমেই তার নজরে পড়ল, রাস্তার বাঁদিকে যেখানে আগে বাঁশবন ছিল, এখন সেখানে একটা ছোট ঘর। বাইরে লেখা আছে—ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়। নতুন ব্যাপারটা; এ গ্রামের ত্রিসীমানায় কোনোদিন ডাক্তারখানা ছিল না। একজন লোককে জিজ্ঞেস করে জানলে, একটু দূরে গিয়ে পুকুরপাড়ে যে খড়ের ঘর, সেটাই ডাক্তারবাবুর কোয়াটার্স। ডাক্তারবাবু ব্রাহ্মণ শুনে বিষ্ণু ভাবলে অন্য কোথাও আশ্রয় প্রার্থনা করার চেয়ে ওখানে যাওয়া ভাল। ডাক্তারবাবুর বাসা খুঁজে বের করতে দেরি হলো না। বাইরেই ডাক্তারবাবু বসে ছিলেন, হাত-কাটা ফতুয়া, ন-হাতি ধুতি পরনে। পাড়াগাঁয়ের ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার, ওর চেয়ে কি ভাল বেশভূষা বা হবে। বিষ্ণুকে বললেন—কোথা থেকে আসছেন?

—কলকাতা থেকে। একটু জায়গা দিতে হবে রাত্রে।

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—স্বচ্ছন্দে থাকুন। আমার এই বাইরের ঘর খালিই পড়ে থাকে। যাবেন কোথায়?

—যাব আর ক্রোশ পাঁচ-ছয় এদিকে। আপনি বোধ হয় বিদেশী, সব গ্রামের নাম জানেন না।

—আজ্ঞে না। আমি বিয়ে করেছি এই দেশেই, ধুতরোবেড়ে—

বিষ্ণুর মুখে কৌতূহলের রেখা ফুটে উঠল। বললে—ধুতরোবেড়ে? আপনার শ্বশুরের নাম কি?

ডাক্তারবাবু বললেন—কেন, চেনেন নাকি কাউকে? ধুতরোবেড়ের কালিদাস বাঁড়ুজ্যে আমার শ্বশুর—

বিষ্ণু চমকে উঠল। হঠাৎ যেন চোখের সামনে কতকগুলো কি মাকড়সার জালের মত ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—না, চিনি নে। আমি এমনি বলছি। আমিও নতুন এদেশে।

ডাক্তার তারপর কি সব বকে যেতে লাগল, বিষ্ণু কিছু বা শোনে, কিছু শোনে না—উত্তরগুলো বোধ হয় কিছু কিছু অসংলগ্ন হতে লাগল। ভাগ্যিস ডাক্তার কিছুক্ষণ বকুনির পর বাড়ির ভেতর চলে গেল অতিথির ব্যবস্থা করতে তাই রক্ষে। নতুবা বিষ্ণু মুশকিলে পড়ে যেত।

এ তাহলে নন্দিকে বিয়ে করেছে।

কিন্তু অদ্ভুত ভাগ্যের বিপর্যয়। এতকাল পরে ঘুরতে ঘুরতে কিনা সে এখানে এসে হাজির হলো একেবারে নন্দির স্বামীর বাড়িতে!

কিন্তু তার চেয়েও বিপদ যে, সে এখানে এসেছে, সে কথা নন্দিকে জানতেদেবে, না দেবে না? না জানতে দেওয়াই ভাল। তাকে এক রাত্রের জন্যে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে চলতে হবে। যদি বাড়ির মধ্যে খেতে নিয়ে যায় ডাক্তার?ধুতরোবেড়ে গ্রামের সেসব স্বপ্নময় দিন কতকাল কেটে গিয়েছে। অদ্ভুত সব দিন, এখন মনে হয় তারা স্বপ্নের মত অবাস্তব। এই পৌষ মাসে ছোট এড়াঞ্চির সাদা ফুলে ভর্তি বনঝোপের মাথায় দিনশেষের রাঙা রোদের সঙ্গে সেসব দিনের স্মৃতি জড়ানো আছে। এদের সঙ্গে যে সুন্দর মুখের সম্বন্ধ ছিল তার জীবনে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত বাস্তব—যা এতদিন ধরে মধুর স্মৃতির কুয়াশা সৃষ্টি করে রেখেছে—আজ তাকে সে চলে যেতে দেবে না। দিলে হয়তো সে ভুল করবে—কে জানে। প্রত্যক্ষ বাস্তবতার রূঢ় আঘাতে স্বপ্ন যদি ভেঙে যায়? সে নন্দি যদি না থাকে? ষোল বছর আগের সে নন্দি?

ষোল বছর দেখেনি সে তাকে। কত বিনিদ্র রজনী প্রথমে সে যাপন করেছে, কত চোখের জল ফেলেছে যার কথা ভেবে, তারপর হয়তো বিস্মৃতির উপলেপনে শান্ত স্নিগ্ধ মধুর হয়ে এসেছিল যার স্মৃতি—আজ এতদিন পরে সে এভাবে এত কাছে এসে পড়বে, এ কে ভেবেছিল?

ডাক্তারবাবু এই সময় চা ও একটা বাটিতে দুটি চিঁড়েভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন—একটু চা খান। আর এই সামান্য কিছু মুখে দিন। পাড়াগাঁ জায়গা, কি বা আছে? নতুন পাটালি এনে দেব একটু? ভাল পাটালি আছে। আমার স্ত্রী বললে, যদি খান, জিজ্ঞেস করে এস।

বিষ্ণু হেসে বললে—আমাকে কি শহুরে বাবু পেয়েছেন? এ সময় খেজুরগুড়ের পাটালি তো দেবভোগ্য জিনিস—নিশ্চয় খাব।

নন্দি বলেছে তাকে পাটালি দিতে! সে কি জানে, এতদিন পরে কে এসে তার বাড়িতে অতিথি হয়েছে? বিষ্ণুর মনে পড়ে অনেকদিন আগের বিকচোন্মুখ একটি রজনীগন্ধার ছড়ি, প্রভাতের সোনালি সূর্যালোক এসে পড়েছে শিশিরসিক্ত আধফোটা কুঁড়ির ওপর। এমনিতর জ্যোৎস্নারাতে ধুতরোবেড়ে গ্রামে আজ ষোল-সতের বছর আগে বাঁড়ুজ্যে-বাড়ির বেলতলায় একটি কিশোরীর ছবি আবার মনে আসে। তার স্বপ্নের মায়াকাজল পরা ডাগর চোখের স্মৃতি হয়তো কিছু অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল, কিন্তু আজ হঠাৎ এই সন্ধ্যায় সেগুলো এত স্পষ্ট হয়ে উঠল একেবারে এখানে এসে পড়েছে বলেই।

একবার তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগল, ডাক্তারকে সে বলে—আপনি কালিদাস বাঁড়ুজ্যের মেয়ে নন্দিনীকে বিয়ে করেছেন বুঝি?

তখুনি ডাক্তার অবাক হয়ে বলবে—আপনি, আপনি চেনেন নাকি?

—হ্যাঁ, আমি ওই গাঁয়েরই ছেলে—মানে, ছিলাম—

—ও বটে, বটে! মশায়ের নামটা কি?

—বলুন গিয়ে ধুতরোবেড়ের বিষ্ণু ঘোষাল এসেছে বাইরে।

নন্দি তখনই ছুটতে ছুটতে আসবে, কিশোরী নন্দিনী যেমন তার আসবার খবরপেলে বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে বাইরে আসত!

—বিষ্ণুদা?

—কি রে নন্দি, কেমন আছিস?

—এতকাল পরে কোথা থেকে? তুমি কি করছ, কেমন আছ? গাঁয়ে আর যাও না কেন?

—সেসব কথার উত্তর দিচ্ছি—তুই বোস আগে, কথা বলি। ষোল বছর পরে দেখা, একগাদা কথা জমে রয়েছে।

—বল বিষ্ণুদা, সব শুনব। কতকাল তোমার সঙ্গে দেখা নেই! আগে তোমায় খাওয়াই, তার পর সারারাত বসে গল্প করব—কেমন তা?

কিন্তু এসব কি সত্যি হবে? নন্দি কি এখনও সেই চঞ্চলা তরুণী আছে, লঘুগতি হরিণীর মত ত্রস্তব্যস্ত হবে তার পদক্ষেপ আজও? কিংবা নন্দির মেদভারমন্থর মনে সে ব্যাকুলতা ক্ষিপ্রতা সজীবতা আজ যদি না থাকে? পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ের মা মোটাসোটা গিন্নিবান্নি নন্দির মধ্যে সেই বিকচোন্মুখ রজনীগন্ধাকে যদি খুঁজে না পায়?—বিষ্ণু ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

ডাক্তার বললে—মশায়, ঘুম পাচ্ছে নাকি? বালিস এনে দেব?

—না না, এই তো সন্দেবেলা।

—রাস্তা হেঁটেছেন কিনা, তাই বলছি—

—না, ঘুমুব না।

—তামাক খান?

—থাক, সেজন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আচ্ছা, এ ছোট্ট গাঁ আপনার ভাল লাগে?

ডাক্তারবাবু হেসে বলে উঠল—দেখুন দিকি কাণ্ড, ভাল লাগা না লাগার তো কোনো মানে হয় না। আমি করি চাকরি, পেটের দায়ে বন্দী—ভাল আমাকে লাগাতে হবে। যেখানে ভাত, সেখানে শান্তি।

—তা তো বটেই।

—আগে ভাল লাগত না, এখন সয়ে গিয়েছে। যা হোক দু-পয়সা পাই এখানে। আশেপাশের আট-দশখানা গ্রামের লোক আমাকেই ডাকে। দু টাকা ফি করেছি আর বর্ষাকালে গরুরগাড়ির ভাড়া। শীতকালে এখন সাইকেলে যাই। এইসব গ্রামের চাষীরা বছরে যা দেয়, তাতে একটা গোল ভর্তি হয়ে যায়—খাবার সময় বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখবেন এখন। ভাল কি সাধে লাগে?

স্থূল তৃপ্তিবোধে ডাক্তারের ছোট ছোট চোখ আরও যেন বুজে ছোট হয়ে আসে। বিষ্ণুর ভাল লাগে না সেটা। এ ধরনের স্থূল অনুভূতির প্রকাশ তার কাছে চিরকালই বিরক্তিকর। অন্য কথা পাড়বার চেষ্টায় সে বললে—এ জায়গায় ম্যালেরিয়া কেমন?

—ম্যালেরিয়া খুবই। ম্যালেরিয়াই লক্ষ্মী, আছে বলেই দু পয়সা যা হোক রোজগার করি। একটি মেয়ে প্রায় বিয়ের বয়সে পা দেব-দেব করছে—সামনের বছরবিয়ে দিতেই হবে।

বিষ্ণু নিজের অলক্ষিতে চমকে উঠল। একথা সে জিজ্ঞেস করেনি, জানতেও চায়নি।

নন্দির মেয়ে বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে।

কত বয়স হবে, ষোল সতের? না, এইসব পল্লীগ্রামের সমাজে বিবাহের ঊর্ধ্বতম বয়স তো অত নয়, সে ভুলে যাচ্ছে। তের চোদ্দ বছরের বালিকা হবে বোধ হয়। যাক—সে কথায় তার দরকার কি। অন্য কোনো দরকার নয়—নন্দির বর্তমান চেহারা সেবুঝতে চাইছে তার ছেলেমেয়ের সংখ্যার মধ্যে দিয়ে।

এমন সময় বাইরে থেকে কে ডাকল—ডাক্তারবাবু আছেন?

ডাক্তার উঠে বাইরে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বললে—আমাকে যে একবার চাঁপাবেড়ে যেতে হচ্ছে জরুরি কল-এ। তাই তো, শক্ত কেস। গরুরগাড়িতে যাব আসব—তিন চার ক্রোশ দূর হবে। আমার তো থাকবার জো নেই। ফিরতে শেষরাত। আপনি রইলেন, আমি বাড়িতে বলে যাচ্ছি, কোনো অসুবিধা হবে না।

—না না, অসুবিধা কি।

—শক্ত কেস না হলে রাত্রে যেতাম না। আপনি থাকবেন, বেশ দুজনে গল্প করছিলাম—

—তাতে কি? তা বলে কল-এ যাবেন না। কোনো ভাবনা নেই—যান আপনি।

—আমি যা হয়েছে দুটো খেয়ে নিই—আপনাকে এরপরে ওরা খাবার দেবে এখন, বাড়িতে বলে যাচ্ছি।

ডাক্তার খানিক পরে সেজেগুজে স্টেথসকোপ নিয়ে গরুরগাড়িতে বার হয়ে চলে গেল।

বিষ্ণুর মনের অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেল ডাক্তার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। নিজেকে সংযত করে রাখা যে এত কঠিন, তা কোনোদিন সে ভেবেছিল?

এই বাড়িতেই নন্দি থাকে, একবার খবর পেলেই সে ছুটে আসবে, ষোল বছর পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে—এ চিন্তাকে সে প্রাণপণে দমন করে রাখতে চেষ্টা করে।

নন্দি তাদের গ্রামের মেয়ে, তার বাল্যসঙ্গিনী, এক বোঁটায় দুটি ফুলের মত জীবনে অনেক বছর কাটিয়ে এসেছিল। নন্দির সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে না এ সে জানত। তারা ঘোষাল বামুন, নন্দির বাবা নিকষ কুলীন। ঘোষাল না হয়ে চাটুজ্যে মুখুজ্যে হলেও বিশেষ কোনো আশা ছিল না তার। তবুও সে চেষ্টা করেছিল।

কুমোরপাড়া থেকে হাঁড়ি কিনে সে ফিরছে—নন্দিদের বাড়ির সামনের পথ দিয়ে। ওদের বেড়ার গায়ে বড় নিমগাছটার তলায় নন্দি দাঁড়িয়ে। বিষ্ণুর মনে হলো ও যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছে। বিষ্ণু কাছে আসতেই নন্দি এদিক ওদিক তাকিয়ে নীচু সুরে বললে—বিষ্ণুদা, একটা কথা আছে।

—কি?

—পিসিমার কাছে ও কথা বলেছ কেন? বাবাকে জান না?

বিষ্ণু চুপ করে রইল।

—মাঝে পড়ে কি হবে জান, আমি বকুনি খেয়ে মরব।

বিষ্ণু এ কথায় মনে আঘাত পেলে। এইটুক আত্মত্যাগ সে নন্দির কাছে প্রত্যশা করতে পারে না? নন্দির একথা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতও বটে।

সে শুধু বললে—ও!

নন্দি ঝাঁঝের সঙ্গে বলে—'ও'! না। শুধু "ওঃ' বললে কি হবে? এ নিয়ে বাড়িতে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে তুমি জান না। আমাকে তো বকুনি খেতেই হচ্ছে তোমার সঙ্গে মিশি বলে—তা ছাড়া তোমার নিন্দেও আর যে আমি সহ্য করতে পারছি নে বিষ্ণুদা? বিষ্ণু বিস্ময়ের সঙ্গে ওর মুখের দিকে চাইলে। নন্দির চোখে জল চকচক করছে, চোখের জলে গলার সুর আটকেছে। সে উত্তর দেবার আগেই নন্দি বললে—যাও, তুমি পালাও—এখনি এ পথে কে এসে পড়বে। বাবা বাড়ি নেই, মা-রা সব নদীর ঘাটে—তাই তোমাকে কথাটা বলতে এলাম।

—কি করে জানলি আমি এ পথে—?

—ছাদ থেকে দেখি তুমি হাঁড়ি হাতে আসছ। আচ্ছা চলি—খবরদার, কোনো কথা আর যেন—

নন্দি মুখের কথা শেষ না করে পিঠের ওপর ঝোলানো লম্বা বেণী দুলিয়ে ছুটে পালাল। কিন্তু বিস্মিত বিষ্ণু কয়েক পা যেতে না যেতেই নন্দি আবার ওকে ডেকে বললে—ও বিষ্ণুদা, শোন একটা কথা, ও বিষ্ণুদা—

—কি রে?

—শোন, সরে এস আর একটু—

—কি?

—তোমার সাহস আছে?

—কেন?

—আমায় নিয়ে পালিয়ে যেতে পার?

বিষ্ণু কথাটা ভাল করে যেন বুঝতে পারলে না, ইতস্তত করে বললে—পালিয়ে? ...কি রকম? তোকে নিয়ে?...তা—

নন্দি ঘাড় দুলিয়ে বাঁকিয়ে এক অপূর্ব ভঙ্গি করে বললে—বুঝেছি। খুব পুরুষমানুষ তুমি! সময় নেই, হাঁ কি না জবাব চাই। আমি যা বলব তুমি তাতে রাজি আছ? সাহস হয়?

—তা কেমন করে সম্ভব নন্দি?

—ও! কেন অসম্ভব শুনি?

—দূর পাগলী! তা হয় না।

—হয় না কেন?

—এ কি ছেলেখেলা নন্দি—কত কথা ভাবতে হবে। টাকা কোথায়? রাখব কোথা? মা-বাবা কি ভাববেন?

—যেন আমার কিছু ভাববার নেই। আমার মা-বাপ নেই? বুঝতে পেরেছি তোমাদের বিদ্যে। এই তুমি পুরুষমানুষ! আচ্ছা তুমি যাও—

স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি বিষ্ণুকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই নন্দি একছুটে ওদের বাড়ির খিড়কির দোরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল।...

নন্দির সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি, কেবল হয়েছিল অতি অল্পক্ষণের জন্যে বিয়ের রাত্রে। কন্যা-সম্প্রদান সমাধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ওদের বাড়ি থেকে চলে এসেছিল, নিমন্ত্রণ খেতেও বসেনি গ্রামের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে।

বিয়ের পরদিন সকালে নন্দির ছোট বোন মালতী ওকে পথে দেখে বললে—কাল কোথায় পালালে বিষ্ণুদা? দিদি দু'বার তোমাকে ডাকতে পাঠালে। বাসরঘরে আমায় চুপি চুপি বললে—বিষ্ণুদাকে ডেকে নিয়ে আয়। আমি তোমায় কোথাও দেখতে পেলাম না।বামুন খেতে বসবার সময়ে দিদি আবার বললে—এইবার নিশ্চয় বিষ্ণুদা খেতে বসেছে, বলে আয়। আবার আমি বাইরে ছুটে এলাম তোমায় ডাকতে—কোথাও দেখলাম না। তুমি কাল খাও নি কেন আমাদের বাড়ি?

—খাই নি কেন, তোর কাছে এখন কৈফিয়ৎ দিতে পারি নে, যাঃ—

মালতী ঘাড় দুলিয়ে বললে—আহা, কথার ছিরি দ্যাখো না! আমি ভালর জন্যে বলতে গেলুম—

—যা, ভালর জন্যে বলতে হবে না, খুব হয়েছে।

—বর দেখেছ?

—একবার একচমক দেখেছিলাম। ময়দা মাখছিলাম গোয়ালের চালায় আমি আর নটবর—বর দেখি কখন? তোর দিদি চলে গিয়েছে?...

—এই এখন গেল। যাবার সময় দিদি বললে—দেখে আয় বিষ্ণুদা বাইরে আছে কিনা। আমি মরি ছুটোছুটি করে—একবার ঘর একবার বার। দিদি চোখের জল ফেলছিলতুমি খাও নি বলে—জান?

—হয়েছে, যা—

কতকালের কথা সব! তারপর সুদীর্ঘ ষোলটি বছর কেটে গিয়েছে। ধুতরোবেড়ে গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নন্দির বিয়ের কয়েক মাস পরেই। বাবা মারা গেলেন, মামা এসে ওদের নিয়ে গেলেন তাঁদের দেশে। গ্রামের খড়ের ঘর অযত্নে ভেঙে-চুরে ধূলিসাৎ হলো।

হঠাৎ বিষ্ণু চমকে উঠল।

চোদ্দ-পনের বছরের কিশোরী নন্দি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে—সেকালের মত মৃদুমধুর স্বরে জিজ্ঞেস করছে, আপনাকে কি এখন খাবার দেওয়া হবে, মা জিজ্ঞেস করলেন—

—ও!, তা—

ওর চম্‌কে ওঠার ভাবে মেয়েটির বোধ হয় হাসি পেল। ঠোঁটের প্রান্তে হাসি চেপে বললে—খাবেন এখন?

—তুমি বুঝি ডাক্তারবাবুর মেয়ে?

—হ্যাঁ।

—নাম কি তোমার খুকি?

—তুলসী।

—এখানে একটু বোস না। খাব এখন একটু পরে। আচ্ছা, তোমার বাবা মা এ কি রকম নাম রাখলেন তোমার? তুলসী হবে তোমার ঠাকুমা দিদিমার নাম। তোমার নাম তুলসী হলে কি মানায়? তোমার নাম হবে রেবা, রেখা, সিপ্রা, অনীতা, নিদেনপক্ষে সুকুমারী, সুলোচনা, নলিনী এই সব। তা না—তুলসী!—ছোঃ—

বিষ্ণুর কথার ভঙ্গিতে মেয়েটি হেসে ফেললে। চোখ নীচু করে শান্ত সুরে বললে—ঠাকুরমা রেখেছিলেন। আমি যখন হই, ঠাকুরমা বেঁচে ছিলেন কিনা।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

—নদে জেলা, মদনপুরের কাছে। দেশে বড় তো যাওয়া হয় না। বাবার যেখানে চাকরি সেখানেই থাকতে হয়।

—তুমি বড়?আর কটি ভাইবোন?

—আমার ছোট আর দুই বোন, ছোট আর একটি ভাই এই দু বছরের।

—বেশ।

খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর মেয়েটি বললে—এইবার খাবেন?

বিষ্ণু বললে—মন্দ নয়। জায়গা এই বাইরের ঘরেই কর।

—কেন, ভেতরের রোয়াকে করি। রোয়াকের ওপর চালা আছে।

—না-না—তুমি বাইরের ঘরে এখানেই জায়গা কর খুকি। বাড়ির মধ্যে দরকার নেই।

মেয়েটি বাড়ির মধ্যে চলে গেল, কিন্তু অনেকক্ষণ পরে এসে বললেন—মা বললেন—এখানে খাওয়ার অসুবিধা হবে। রান্নাঘরের রোয়াকে জায়গা করে দিতে বললেন।

বিষ্ণু ব্যস্ত হয়ে বললে—না-না—তুমি খুকি বাইরে জায়গা করে দাও। কোনো অসুবিধে হবে না। বাড়ির মধ্যে আমার বাধ-বাধ ঠেকবে। এখানেই দাও।

খুকি বাড়ির মধ্যে চলে গেল আবার।

বিষ্ণুর সমস্ত দেহমন চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এই মেয়েটির মধ্যে পনের বছরের কিশোরী নন্দিকে কতকাল পরে আবার প্রত্যক্ষ করলে সে। সেই চোখ-মুখেরভঙ্গি, সেই হাসি! স্বপ্নের মত মনে হয় সব।

বাইরের ঘরেই খাবার জায়গা করে দেওয়া হলো। তুলসী পরিবেশন করলে। দোরের বাইরে ফিস ফিস শব্দ শুনে বিষ্ণুর মনে হলো, এর মা রান্নাঘর থেকে খাবার বয়ে নিয়ে এসে ওকে সাহায্য করছে। বিষ্ণু আগে থেকেই সতর্ক হয়ে দোরের দিকে পিছন ফিরে বসেছে। নন্দি যেন কিছুতেই জানতে না পারে আজ সে তারই বাড়িরঅতিথি।

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। রাত বেশি হয়নি। পাড়াগাঁয়ে শীতের রাত্রে সকাল সকাল লোকে আহারাদি চুকিয়ে ফেলে। বিষ্ণু একটা ব্যাপার বেশ বুঝতে পারলে আজ সে এখানে থাকলে নন্দিকে না ডেকে, তার সঙ্গে দেখা না করে থাকতে পারবে না। বার বার তাকে এ ইচ্ছা দমন করতে হয় প্রাণপণে। বার বার আবার অন্য পথ দিয়ে সেটা এসে মনকে চঞ্চল করে তোলে। ধমনীতে উন্মাদ রক্তস্রোত বইতে শুরু করেছে। মন, বলছে—নন্দিকে ডাক, জীবনে এমন অবসর আর পাবে না। কতদিন পরে! দেখা করবে না?

ঘুম অসম্ভব। না, সে একটিবার নন্দিকে খবর পাঠাবে। দেখা করতে দোষ কিছুই নেই, তুলসীকে ডেকে খবর পাঠাবে? কি ভাবে বলবে? তুলসী, তোমার মামার বাড়ি কোন্ গ্রামে? ধুতরোবেড়ে? তোমার মা তাহলে আমাদের গ্রামেরই মেয়ে। বল গে, ধুতরোবেড়ের শিবনাথ ঘোষালের ছেলে বিষ্ণু ডাকছে, দেখা করবে। না, ওভাবে নয়। তুলসীকে ডেকে, কথায় কথায় তাকে শুনিয়ে দেবে যে তার বাড়ি ধুতরোবেড়ে। এতে তুলসী

নিশ্চয় বলবে যে তার মামারবাড়িও সেই গ্রামে। ডাক্তারের সঙ্গে এ সম্বন্ধে যে কথা একবার হয়েছিল, তুলসী তার খবর রাখে না। তুলসী তখন তার মায়ের কাছে ঠিক গিয়ে বলবে, বাইরের ঘরে যিনি এসেছেন, তিনি ধুতরোবেড়ের লোক। নন্দি নিশ্চয়ই বলবে, নাম কি জিজ্ঞেস করে আয়। বাপের বাড়ির গ্রামের লোক সম্বন্ধে নন্দি উদাসীন থাকতে পারবে না। সে বলবে—বল গিয়ে ধুতরোবেড়ের শিবনাথ ঘোষালের—ইত্যাদি। নন্দি ছুটতে ছুটতে আসবে বাইরের ঘরে।

বিষ্ণু বিছানা থেকে উঠে বসল। উত্তেজিত ভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করলে বাইরের দিকের রোয়াকে। তারপর ডাক দিলে—তুলসী, তুলসী!

তুলসী ছুটে এল বাইরের ঘরে।

বিষ্ণু বললে—ডাক্তারবাবু কখন ফিরবেন খুকি?

গলার সুর অনেকটা নীচু করেই সে কথা বলছে অনেকক্ষণ থেকে। তুলসী বললে—তা তো জানি নে। মাকে জিজ্ঞেস করে আসব?

—না, থাক। হ্যাঁ শোন, আমি এখুনি চলে যাব। বিশেষ জরুরি কাজ মনে পড়ল। ট্রেন ধরতে হবে গিয়ে। তোমরা বাইরের দোর বন্ধ করে দাও।

তুলসী অবাক হয়ে বললে, এত রাত্রিতে এই শীতে এখন যাবেন কেন? কাল সকালে উঠে—

বিষ্ণু ব্যস্তভাবে বললে—না—না, আমার খুব জরুরি দরকার। এই রাত বারোটার ডাউন খুলনা মেলেই যেতে হবে। তুমি বাড়ির মধ্যে গিয়ে বলগে—

তুলসী তখুনি বাড়ির মধ্যে গিয়েই আবার ফিরে এসে বললে—মা বারণ করেছেন। এসব দেশ ভাল না। এত রাত্রিতে যাবেন না। বাবা রাত তিনটের মধ্যে আসবেন। আপনি না হয় সেই গরুরগাড়িতে যাবেন—হেঁটে একা যাবেন না ইস্টিশানে।

নন্দি বারণ করে পাঠিয়েছে। কাকে বারণ করেছে না জেনেই বারণ করে পাঠিয়েছে। বিষ্ণু হঠাৎ যেন রূঢ় হয়ে উঠল। ঈষৎ রুক্ষ কর্কশ সুরে বললে—না—না, আমার কাজের ক্ষতি হবে। থাকবার জো নেই। বাইরের দরজা বন্ধ করে দাও।

বিষ্ণু সরলা গ্রাম্য বালিকাকে অবাক করে দিয়ে এক রকম ছুটেই বাড়ির বার হয়ে গেল। তার পর—নিঃসঙ্গ তারা-ভরা রাত্রি। মাঠের পর মাঠ। পৌষের কনকনে শীত। প্রস্ফুট সর্ষেফুলের সুগন্ধ। বহুদিনের স্বপ্নভরা প্রথম যৌবনের নেশা ওর শিরায় শিরায়।